ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 38- 46
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.177

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারী: এক বিশ্লেষণী পাঠ

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, শ্রীভূমি, অসম, ভারত*
অপরাজিতা ভট্টাচার্য, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, অসম, ভারত*

Received: 15.09.2025; Accepted: 23.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Rabindranath Tagore's short stories, the figure of the protesting woman emerges as a powerful and contemporary theme. His female characters are not confined to traditional roles; rather, they challenge societal norms and assert their independence, dignity, and identity. Tagore presents these women as individuals with strong inner strength, consciousness, and the ability to think and act for themselves. The protest of women in Tagore's stories is not always external or loud. It often takes the form of silent resistance, inner confidence, and thoughtful defiance. These women reject the oppressive customs and expectations of a patriarchal society and seek to live life on their own terms. Their rebellion is deeply personal, reflecting a desire for self-respect and the right to make their own choices. Tagore's stories highlight two main aspects of women's protest: first, the struggle to protect their basic rights and self-respect, and second, the rejection of unjust social norms. Through this, he portrays a new vision of womanhood that is independent, intelligent, and emotionally strong. Several of his stories showcase these themes. In StrirPatra, Mrinal leaves her husband's house, refusing to accept the hypocrisy and oppression of upper-caste society. In Denapaona, the evils of the dowry system are exposed, where women suffer due to material demands. Haimanti criticizes the traditional marriage system and highlights the emotional suffering of a sensitive and educated woman. Shasti shows a woman who silently accepts injustice rather than support a false social order. Stories like 'Dui Bon', 'Mahamaya', 'Laboratory' depict women who assert their own choices, values, and self-worth. Tagore does not limit his female characters to domestic roles. He presents them as full human beings with dreams, thoughts, and inner power. His belief that "women's liberation will come one day; she will open her own path" reflects his progressive vision. These protesting women are not just characters—they represent a new beginning, a challenge to patriarchal society, and a step toward gender equality. Tagore's portrayal of the protesting woman is both a literary and social statement. It marks the rise of a new consciousness where women are not only resisting oppression but also redefining their place in society with confidence and dignity.

Keywords: Women protest, Liberation, Domestic roles, Gender Equality

প্রতিবাদ হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেখানে লুকিয়ে থাকে অধিকার আদায় তথা নিজের সম্মানের জন্য তীব্র লড়াই। সমাজে যখন তীব্র অবিচার, শোষন, অন্যায় দীর্ঘদিন ধরে চলে তখন তা কলুষমুক্ত করার জন্য চলে এই প্রতিবাদ। প্রতিবাদ হলো অন্যায়, অবিচার বা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ, প্রতিরোধ বা পরিবর্তনের প্রয়াস। এটি সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত বা সাংস্কৃতিক যে কোনো ক্ষেত্রেই দেখা যায়। প্রতিবাদ শুধু উচ্চস্বরে বিরোধিতা করা নয়, এটি হতে পারে নীরব প্রতিরোধ, লেখনী, শিল্পকর্ম, সংগঠিত আন্দোলন বা ব্যক্তিগত অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে। মানুষের চেতনা ও বিবেকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ধারণাও বিবর্তিত হয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায়, রাজতন্ত্র, উপনিবেশবাদ, লিঙ্গবৈষম্য, শ্রেণি-বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই সমাজে পরিবর্তন এনেছে। কখনো ব্যক্তিগত পর্যায়ে, কখনো সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে, কখনো আবার সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলাম, জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্ম বা গণআন্দোলনগুলোর মাধ্যমে আমরা প্রতিবাদের নানাবিধ রূপ দেখতে পাই। প্রতিবাদ শুধু বিদ্রোহ নয়, এটি পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত করে। সমাজের অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতার সৃষ্টি করে, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মনোবল বাড়ায়। পুরুষ প্রধান সমাজে আজও নারীরা অবহেলিত। কিন্তু অবহেলিত, নির্যাতিত হতে হতে যখন তাদের সহনশীলতা কমে যায় তখনই তারা হয়ে উঠে প্রতিবাদীমুখর। নারীরা কারোর দাসী নন, তারা সমাজের বোঝা নন, তারা অবহেলার পাত্রী নন, তাদেরও আছে মন, তাদেরও নিজেদের পরিবারের জন্য মন কাঁদে, তাদেরও ইচ্ছে হয় কথা বলার, কিন্তু তাদের মুখ ফুটে কথা বলার কোনো জো থাকে না। তাদের কথা শোনার মতো কেউ থাকে না। সিমোন দ্য বোভোয়া তাঁর একটি গ্রন্থে বলেছেন-

> "কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে গড়ে তোলে।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারীদের উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য দিক। উনিশ শতকের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীরা যখন অবদমিত, তখন রবীন্দ্রনাথের গল্পে তাদের দৃঢ় অবস্থান এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। তাঁর লেখায় নারীরা শুধু পুরুষের অনুগামী নয়, বরং সমাজের নিয়ম-নীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় এবং নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে নারীর প্রতিবাদ ব্যক্তিগত, সামাজিক ও নৈতিক পর্যায়ে বিভক্ত। নারী জাতির প্রগতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি ছোটগল্পে সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের নারী প্রতিবাদের গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'স্ত্রীর পত্র', 'দেনাপাওনা', 'হৈমন্তী', 'শাস্তি', 'মহামায়া' 'ত্যাগ' ইত্যাদি।

'দেনাপাওনা' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। গল্পটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। প্রথম 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পটিতে পণপ্রথার বিরুদ্ধে একটি অসাময়িক লড়াইয়ের রূপ ফুটে উঠেছে। সমাজে পণপ্রথার বিরুদ্ধে যে লড়াই এবং বিষময় বেদনার রূপ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেনাপাওনা' গল্পে বিয়ে প্রথার সাথে জড়িত সামাজিক অসংগতি, যৌতুকপ্রথার নিষ্ঠুরতা এবং নারীর দুরবস্থার করুণ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমাদের সমাজে আজও অনেক জায়গায় যৌতুকের শিকার হতে হয় বহু নারীকে। ঠিক তেমনি শিকার হতে হয় রবীন্দ্রনাথের নিরুপমাকে। পাঁচ ছেলের পর এক মেয়ে হওয়ায় খুব খুশি রামসুন্দর এবং তার স্ত্রী। আদরে সোহাগে বড়ো করতে লাগলা নিরুপমাকে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা মায়ের তার বিয়ের জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য। অনেক চেষ্টার ফলে রামসুন্দর তার মেয়ের বিয়ে দেন ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে অনেক যৌতুকের বিনিময়ে। গল্পে নিরুপমার শ্বশুর রায়বাহাদুরকে একজন লোভী, শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে উপস্থাপিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নিরুপমার বাবা মেয়ের বিয়ের জন্য তার শেষ সম্বল ভিটে মাটি পর্যন্ত বন্ধক দিয়েছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও সামান্য টাকার লোভে নিরুপমার শ্বশুর এবং শাশুড়ি তাকে অকথ্য কথা শোনাতে শুরু করল। বিয়ে হয়ে আসার পর যখন নিরুপমার শশুড়বাড়ির আত্মীয়রা যখন বলে-

> "আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।"[২]

রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার শাশুড়ি বলে উঠে-

> "শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।"[৩]

অপমানে, নীপিড়নে লাঞ্ছিত হয়ে একদিন নিরুপমা তার বাবাকে কাতর কণ্ঠে বলে উঠে-

> "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।"[৪]

নিরুপমার মতো মেয়েকে সমাজের অর্থপিপাসু মানুষ কোনোভাবেই বাঁচতে দেয়না। তাই নিরুপমাও নিজের আত্মবলিদানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। সেও আর চুপ থাকতে পারেনি, পিতার অপমানের প্রতিবাদ করেছে। এরকম প্রতিবাদ বাংলা সাহিত্যে প্রায়ই বিরল। প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নিরুপমা তার নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের মধ্যে নিরুপমার তীব্র প্রতিবাদের কথা তুলে ধরেছেন।

> "টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না।"[৫]

সমাজে অনেক নিরুপমারা আছেন যারা পণের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে নিজের প্রাণবিসর্জন দিয়ে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়ায়। নিজের নাম এবং নিজের পরিবারের নাম উজ্জ্বল করে। কিন্তু সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করে একদিন নীরবে তাদের চলে যেতে হয় বহুদূরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শাস্তি' গল্পটি সামাজিক অন্যায়, আইনের অন্ধত্ব এবং নারীর অসহায় অবস্থানকে গভীরভাবে তুলে ধরে। গল্পটি একদিকে যেমন বাস্তবতার নির্মম চিত্র তুলে ধরে, অন্যদিকে তেমনি মানুষের মনস্তত্ত্ব ও সমাজের মূল্যবোধের অসারতাকেও প্রকাশ করে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুই ভাই— দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই। তারা কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং গ্রামীণ জীবনের চাপে প্রতিনিয়ত ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। গল্পের সূচনাতেই এই দুই ভাই কাজ শেষে বাড়ি ফিরে দেখে, তাদের জন্য খাবার তৈরি হয়নি। এতে দুখিরাম অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে রাগের বশে তার স্ত্রী রাধাকে দা'র আঘাতে হত্যা করে। এই আকস্মিক হত্যাকাণ্ডের পর দুই ভাই ভয় পেয়ে যায় এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে ছিদাম এক চতুর পরিকল্পনা করে। সে সিদ্ধান্ত নেয়, যদি তার স্ত্রী চন্দরা মিথ্যা স্বীকারোক্তি দেয় যে সে-ই রাধাকে হত্যা করেছে, তাহলে হয়তো পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে। ছিদাম বলে—

> "স্ত্রী তো আবার পাওয়া যাবে, কিন্তু ভাই পাওয়া যাবে না।"[৬]

এই উক্তিটি গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক চিহ্নিত করে, যেখানে নারীর মূল্য একেবারে তুচ্ছ হয়ে যায়। চন্দরা প্রথমে হতবাক হলেও পরে স্বামীর কথায় রাজি হয়, কারণ সে ভাবে, সামান্য সাজা হলেও হয়তো তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু পরিস্থিতি তার ধারণার চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আদালতে যখন বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন, তখন সে আর কোনো আশা খুঁজে পায় না। সেই মুহূর্তে তার ভেতর থেকে সত্য উচ্চারিত হয়—

> "ভাই, আমায় তুমি বাঁচাও। আমি যা বলেছি, তা সত্য নয়।"[৭]

কিন্তু তখন আর কিছুই করার ছিল না। আইনের নিষ্ঠুর নিয়ম এবং সমাজের নির্মমতা চন্দরার জন্য মৃত্যুকে অবধারিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন, কীভাবে সমাজের চোখে নারী শুধু একজন অধীনস্থ ব্যক্তি, যার জীবনের মূল্য তার স্বামীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। ছিদামের কাছে ভাইয়ের জীবন রক্ষার চেয়ে চন্দরার জীবন কোনো গুরুত্বই রাখে না। গল্পটি পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নির্মম বাস্তবতা তুলে ধরে। চন্দরা শুধুমাত্র একজন নারী হওয়ার কারণে সহজেই বলির পাঁঠা হয়ে যায়, অথচ প্রকৃত দোষী দুখিরাম শাস্তি পায় না। এখানেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের গভীরতা— তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে সমাজে সত্য চাপা পড়ে এবং ক্ষমতাহীনরাই সবসময় শাস্তি পায়।

'শাস্তি' গল্পটি কেবল একটি হত্যাকাণ্ড বা ভুল বিচার নিয়ে লেখা নয়, এটি এক ভয়ঙ্কর সামাজিক বাস্তবতার গল্প। এখানে নারীর প্রতি সমাজের অবিচার এবং আইনের অন্ধত্ব একসঙ্গে মিলে চন্দরার করুণ পরিণতি নির্ধারণ করে। চন্দরার শেষ আর্তনাদ—

"আমি যা বলেছি, তা সত্য নয়"- শুধু গল্পের শেষ লাইন নয়, এটি সমাজের প্রতি এক চিরস্থায়ী অভিযোগ।

নারী নিপীড়নের আরও একটি গল্প 'হৈমন্তী' (১৯১৪) । গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় সবুজপত্র পত্রিকায়। সৎ, আদর্শবাদ ব্যক্তি গৌরীশঙ্করের একমাত্র মেয়ে হৈমন্তী। খোলামেলা নির্ভেজাল পরিবেশে জন্ম হয় তার। তার বিয়ের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত। বাবা মায়ের আদুরে হওয়ায় তার বাবা ঠিক করলেন সঠিক পাত্রের হাতেই তাকে দিবেন। কিন্তু সমাজের

অমোঘ পরিহাস তাকে সমাজে আর টিকে থাকতে দেয় নি। পুরুষশাসিত সমাজে তার বয়স একটু বাড়তি হওয়াতে তাদের প্রায় একঘরে দেওয়ার মতো অবস্থা।

> "...মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গেছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমের বাড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেজন্যই তাড়া।"[৮]

নারী অবমাননার বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদী গল্প এটি। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হৈমন্তীর বয়স বেশি হওয়া সত্ত্বেও পণের টাকার লোভে পাত্রের বাবা পাত্রের সাথে তার বিয়ে দেন। হৈমন্তীর সতেরো বছর বয়সটাই তার কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গৌরীশঙ্করবাবুর লাখ টাকার গুজবের পরিবর্তে অপুর মা বাবা যখন জানতে পারল যে হৈমন্তীর বাবা ধারদেনায় লিপ্ত হয়ে, আকণ্ঠ ঋণে জর্জরিত হয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ঠিক তখন থেকে হৈমন্তীরও তার শ্বশুরবাড়িতে শুরু হয় অপমান, লাঞ্চনা। আত্মীয়রা যখন তার বয়স জিজ্ঞাসা করল তখন সে নির্দ্ধিধায় সত্যি কথাই বলেছে। এই নিয়েই অশান্তি শুরু হয় তার শ্বশুর বাড়িতে। অপুর মা সকল আত্মীয়ের সামনে বলে উঠলেন-

> "তোমার বাবা যে বলিলেন তোমার বয়স এগারো।"[৯]

হৈম কোনো অবস্থাতেই তার বাবার অপমান সহ্য করতে পারল না। হৈম প্রতিবাদে কণ্ঠে সোচ্চার হয়ে বলল-

> "বাবা বলিয়াছেন? কখনো না। ... আমার বাবা তো কখনোই মিথ্যা বলেন না।"[১০]

হৈমর পিতা ছিল খুব শিক্ষিত, তাই পিতার সেই গুণ হৈম নিজেও আয়ও করেছে অনায়াসেই। এই সুশিক্ষার জন্যই হৈমর মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটে। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধই তাকে সামজিক প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তোলে। কিন্তু পিতার মতো এমন বলিষ্ট, দৃঢ়, ন্যায়পরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও সমাজের পরিহাসে তাকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়। তার পিতা তাকে তার শ্বশুরবাড়িতে দেখতে আসতে গেলে সে অভিমান করে তার পিতাকে বলে-

> "বাবা, আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এই বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।"[১১]

উক্তিটির মধ্যে হৈমর বাবার প্রতি ঘভীর আর্তনাদ, তার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির প্রতি জোর প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গল্পে একদিকে যেমন যৌতুকের বিরুদ্ধে, মিথ্যার বিরুদ্ধে হৈমন্তীর তীব্র প্রতিবাদী সত্তা প্রকাশ করেছেন, ঠিক অন্যদিকে হৈমন্তীর উপর তার শ্বশুরবাড়ির মানুষের অত্যাচারের প্রতি অপুর নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হৈমন্তী আসলে একটি জ্বলন্ত প্রতিবাদ। 'হৈমন্তী' শুধুমাত্র এক ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়, এটি সমগ্র বাঙালি সমাজের এক দুঃখজনক বাস্তবতাকে তুলে ধরে। রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং সমাজের কূপমণ্ডূকতা ভেঙে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আহ্বান জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিও নারীর অবমাননা ও অপমানের জন্য হওয়া তীব্র প্রতিবাদের একটি করুণ কাহিনি। গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে যে রয়েছে সে হলো মৃণাল। তাকে ঘিরেই গল্পটি প্রাণস্পন্দন লাভ করেছে। পুরুষশাসিত সমাজ কোনোভাবেই একজন বন্ধ্যা নারীকে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না। তারপরও সে বিন্দুকে পেয়ে তাঁর সমস্ত কিছু ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু যখন বিন্দু আত্মহননের পথ বেছে নিল তখন কোনোভাবেই মৃণাল আর চুপ করে থাকতে পারল না, সেখানেই সে প্রতিবাদ জানালো।

> "মৃণাল আগাগোরা বিদ্রোহের প্রতিমূর্তি। এই বিদ্রোহ স্বামীর পরিবারের নিয়ম কানুনের বিরুদ্ধে যেমন, তেমনি রুগ্ন মধ্যযুগীয় পিতৃতান্ত্রিক পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধেও। বিন্দুর প্রতি সকলের অমানবিক ব্যবহার দেকে মৃণাল মধ্যযুগীয় মূল্যবোধহীন সমাজের চেহারাটা উপলব্ধি করেছে। এইজন্য সবরকম সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ। মৃণাল বিন্দুকে দেখে উপলব্ধি করেছে সংসারে নাড়িদের অবস্থান কোথায়! এইজন্যই পত্নীত্ব থেকে নারীত্বের মহিমায় তার মুক্তিসন্ধান।"[১২]

গল্পের মুখ্য চরিতে মৃণাল, যে তার স্বামীকে উদ্দ্যেশ্য করে চিঠি লেখেন। এই চিঠির মাধ্যমেই তিনি তার অন্তরের দুঃখ, বেদনা এবং অবদমিত কষ্ট প্রকাশ করেন। চিঠিটি তার জীবনের এক দীর্ঘ যন্ত্রণার স্বীকারোক্তি, যেখানে তিনি বুঝতে পারেন, এতদিন তিনি সংসারে থেকেও কেবল এক বন্দী নারী ছিলেন। মৃণালের প্রতিবাদিনী সত্ত্বা তখনই জেগে

উঠে যখন তার বিন্দুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। বিন্দু আসলে তার শ্বশুড়বাড়ির দিকের পরিচিত। গল্পের আগাগোড়াই দেখা যায় নারীর প্রতি সমাজের প্রতিমূর্তি, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নারীর প্রতি অবমাননা এবং এসবের বিপরীতে ফুটে উঠেছে নারীর প্রতিবাদীস্বরূপ। বিন্দুর বিয়ে যখন তারা একটি পাগল ছেলের সঙ্গে দেয় তখন সে সেই পাগল ছেলের থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। বিন্দুর কাছে মনে হয়েছিল এটাই তার একমাত্র পথ। কারণ সমাজের একঘেয়েমি বাঁধা ধরা নিয়মকে সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি, তাই সে প্রতিবাদ করেছে। তার এই প্রতিবাদ তাকে অনন্তলোকের সন্ধান দিয়েছে, সে-ও মোক্ষ প্রাপ্তি লাভ করেছে। সে বিষয়ে মৃণাল প্রতিবাদ করে জানায়-

> "মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান - সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত।"[১৩]

বিন্দুর মৃত্যু যেন মৃণালের চোখ খুলে দেয়। এতদিন তিনি সংসারের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকলেও এবার তিনি বুঝতে পারেন, সংসার আসলে তার জন্য নয়। স্বামী-সংসার-সমাজ এই তিনটি বাঁধনকে অস্বীকার করেই তিনি শ্রীক্ষেত্রে চলে যান। গল্পের শেষে পত্র মারফৎ মৃণাল শিশিরকে জানায় সে আর ফিরে আসবে না। শ্রীক্ষেত্রে এসে সে নিজেকে মুক্ত মনে করছে। তার চিঠির শেষ লাইনটি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

> "তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি—ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। ... এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম।"[১৪]

এই বাক্য একজন নারীর স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা, যেখানে তিনি আর পুরুষশাসিত সমাজের নিয়ম মেনে চলতে রাজি নন। এই গল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী-মনস্তত্ত্বের এক অনন্য বিশ্লেষণ। মৃণালের চরিত্রটি কেবল একজন বিদ্রোহী নারী নয়, বরং প্রতিটি নারীর অবদমিত সত্ত্বার প্রতিচ্ছবি। সমাজ যেভাবে নারীর জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করাই এই গল্পের মূল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ এখানে নারীর স্বনির্ভরতা এবং স্বাধীন সত্ত্বাকে তুলে ধরেছেন, যা তাঁর সময়ের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি। গল্পটি প্রমাণ করে, নারী শুধু সংসারের অলঙ্কার নয়, সে একজন স্বতন্ত্র সত্ত্বাও বটে।

অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা হিসাবে প্রজ্জ্বলিত আরও একটি গল্প 'ত্যাগ'। গল্পটির প্রকাশসাল ১২৯৯ বঙ্গাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'ত্যাগ' শুধুমাত্র প্রেম ও আত্মত্যাগের কাহিনি নয়, এটি সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে এক নীরব অথচ গভীর প্রতিবাদ। এখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার সংকীর্ণ পরিসর, সামাজিক অনুশাসনের নির্মমতা এবং নারীর অবস্থানকে কেন্দ্র করে যে নিঃশব্দ বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে, তা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে। হেমন্ত ও কুসুমের জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কিভাবে সমাজের কঠোর অনুশাসন ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করে, কিভাবে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা সামাজিক শৃঙ্খলার ভারে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়, এবং কিভাবে নীরব ত্যাগ ও আত্মসম্মানের মধ্যে এক ধরনের প্রতিবাদ নিহিত থাকে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হেমন্ত ছোটবেলা থেকেই তার বাবাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে কখনো মিথ্যা বলবে না। এই সত্যনিষ্ঠার চর্চা একসময় তার জীবনে এক গভীর সংকট তৈরি করে। যখন তার মা জানতে চান, সে কুসুমকে ভালোবাসে কিনা, তখন সে সত্য উচ্চারণ করতে পারে না। তার মানসিক টানাপোড়েন স্পষ্ট হয় রবীন্দ্রনাথের লেখায়—

> "হেমন্ত বলিতে পারিল না, কুসুম এতিম, কিন্তু আমি তাহাকে ভালোবাসি।"[১৫]

এখানেই দেখা যায়, সমাজের বিধিবিধান কিভাবে একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব সত্য প্রকাশ থেকে বিরত রাখে। যে সত্যকে রক্ষার জন্য হেমন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, সেই সত্যই একসময় তার প্রতিবাদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটি এক দ্বৈত সংগ্রাম—একদিকে আত্মিক সত্য, অন্যদিকে সামাজিক সত্য। এই গল্পে হেমন্তের প্রতিবাদ দুটি স্তরে ঘটে। প্রথমত, সে সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে তার অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারলো না। দ্বিতীয়ত, তার মৌনতা এবং মানসিক দ্বন্দ্বই একপ্রকার প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। সে কথা না বলে, নিজের অনুভূতিকে দমন করে, কিন্তু তার যন্ত্রণার মধ্যে সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিক্রিয়া লুকিয়ে থাকে।

গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে কুসুমের চরিত্রে। সে সমাজের কাছে অবহেলিত, কিন্তু তার আত্মসম্মান দৃঢ়। সে কারও করুণার পাত্র হতে চায় না, এমনকি হেমন্তের ভালোবাসাও সে ভিক্ষার মতো গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। যখন সে বুঝতে পারে, হেমন্তের মা তাকে মেনে নেবেন না এবং হেমন্ত নিজেও নিজের অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না, তখন সে নিজেই সরে যায়।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"যারে তুমি ত্যাগ কর, সে তোমাকে ত্যাগ করে না।"[১৬]

এই লাইনটি কুসুমের প্রতিবাদের সারাংশকে তুলে ধরে। সে বিদ্রোহ করেনি, উচ্চবাক্য বলেনি, কিন্তু তার চলে যাওয়াই এক শক্তিশালী প্রতিবাদ। সে জানে, ভালোবাসা যদি সামাজিক স্বীকৃতি না পায়, তবে সেটি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তাই সে কাউকে দোষারোপ না করেই সরে যায়, কিন্তু তার এই নীরব চলে যাওয়াই সমাজের অনুশাসনের প্রতি এক তীব্র প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে ওঠে।

'ত্যাগ' গল্পে নারীর অবস্থানের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের সময়ের সামাজিক কাঠামোর এক নির্মম বাস্তবতা। কুসুম শুধুমাত্র একজন এতিম বলেই নয়, একজন নারী বলেও সে সামাজিকভাবে দুর্বল। তার প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই, তার মতামত বা ইচ্ছাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ নারীর অবস্থানের বিরুদ্ধে এক সুক্ষ্ম প্রতিবাদ গেঁথেছেন। কুসুমকে সমাজ মেনে নেবে না, কারণ সে উচ্চবংশজাত নয়, তার সামাজিক পরিচয় নেই। কিন্তু কুসুম তার আত্মমর্যাদার সঙ্গে কোনো আপস করেনি। সে জানে, সমাজের কাছে সে উপেক্ষিত, কিন্তু সে কারও দয়া বা করুণা প্রত্যাশা করেনি। বরং সে নিজের ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়েছে আত্মসম্মানের জন্য।

গল্পের শেষে দেখা যায়, হেমন্ত এক গভীর মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে থাকে। সে কুসুমকে হারানোর কষ্ট সহ্য করতে পারে না, কিন্তু তার সামনে কোনো উপায়ও খোলা থাকে না। সমাজের কঠোর বিধান ও পারিবারিক শৃঙ্খল তাকে যে বন্ধনে আটকে রেখেছে, তার বিরুদ্ধে সে সরাসরি বিদ্রোহ করতে পারেনি, কিন্তু তার অন্তরের যন্ত্রণা তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কখনো কখনো প্রতিবাদ সরাসরি হয় না, কিন্তু তার অভিঘাত গভীর হয়। হেমন্ত ও কুসুমের ত্যাগ কেবল ভালোবাসার বিসর্জন নয়, সমাজের রূঢ়তার বিরুদ্ধে এক নীরব অথচ তীব্র প্রতিক্রিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ত্যাগ' গল্পে প্রতিবাদের বহুমাত্রিক রূপ দেখা যায়— সত্যের প্রতি নিষ্ঠার বিরুদ্ধে সামাজিক শৃঙ্খলার দমন, ভালোবাসার স্বীকৃতির প্রশ্নে পারিবারিক বিধিনিষেধের কঠোরতা, নারীর আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা, এবং সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিরোধ। হেমন্ত ও কুসুম— দুজনেই নিজের মতো করে প্রতিবাদ করেছে, কেউ কথা বলে, কেউ চুপ থেকে। কিন্তু তাদের এই আত্মত্যাগ কেবল ব্যক্তিগত নয়, বরং তা বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর বিরুদ্ধে এক অনুচ্চারিত বিদ্রোহ। এই গল্পের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হলো, এখানে কোনো সরাসরি বিদ্রোহ নেই, তবুও প্রতিটি চরিত্রের সিদ্ধান্তই এক ধরনের প্রতিবাদ বহন করে। সমাজের নিয়ম, পারিবারিক শৃঙ্খলা, নারীর অবস্থান— এসবের বিরুদ্ধে এই নীরব সংগ্রামই ত্যাগ গল্পের মূল আবেদন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নারী প্রতিবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আরেকটি ছোটগল্প 'মহামায়া'। গল্পটি 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মহামায়া' গল্পটি এক সংগ্রামী নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাহিনি, যেখানে সমাজের কঠোর বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে এক নারীর নীরব কিন্তু দৃঢ় প্রতিবাদ ফুটে উঠেছে। মহামায়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে ঠাকুর দেখিয়েছেন কীভাবে এক নারী নিজের জীবনকে আত্মসম্মানের সঙ্গে গড়ে তুলতে পারেন, এমনকি যদি সমাজ তার বিরুদ্ধে থাকে।

গল্পের মূল চরিত্র মহামায়া এক ব্রাহ্মণ কন্যা, যার জীবনকে পারিবারিক এবং সামাজিক নিয়মের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, বিধবা মহিলাদের জন্য কঠোর নিয়ম আরোপ করা হতো, যা নারীর জীবনকে নিষ্প্রাণ ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের এক প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থাপন করত। মহামায়ার স্বামী অল্প বয়সেই মারা যাওয়ায় তাকে বিধবার জীবন বেছে নিতে বাধ্য করা হয়। রবীন্দ্রনাথ তার বর্ণনার সঙ্গে তার ব্যাক্তিত্বকে বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

> "যেন শরতকালের রৌদ্রের মতো কাচাসোনার প্রতিমা- সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।"[১৭]

রবীন্দ্রনাথ মহামায়ার চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন এক নীরব কিন্তু শক্তিশালী প্রতিবাদ।

মহামায়ার প্রতিবাদ শুরু হয় তার আত্মমর্যাদাবোধ থেকে। সে কেবল বিধবা হওয়ার কারণে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া কঠোর নিয়ম মেনে নিতে চায় না। তার মনোবল এবং আত্মসম্মানের প্রকাশ দেখা যায় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায়। যখন সমাজ তাকে পরাধীন করে রাখতে চায়, তখন সে নিজের ইচ্ছা ও স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করে। এ প্রসঙ্গে গল্পের একটি উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ:

> "মহামায়া যখন বিধবা হইল, তখন তাহার সমস্ত জীবন যেন শ্মশানবাসের জন্য প্রস্তুত হইল।"[১৮]

এই শ্মশানবাসের বিপরীতে মহামায়া জীবনের অন্য এক বাস্তবতাকে গ্রহণ করে, যেখানে সে নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়ে দেয়।

মহামায়ার প্রতিবাদ সরাসরি কোনো সশব্দ বিদ্রোহ নয়, বরং এক নিশ্চুপ অথচ সুস্পষ্ট অবস্থান। সে সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি রুখে দাঁড়ায় না, কিন্তু নিজের জীবনকে যেভাবে পুনর্গঠন করে, সেটাই তার বৃহত্তর প্রতিবাদের রূপ। তার জীবনে পরবর্তীতে নতুন প্রেমের সম্ভাবনা আসে, কিন্তু সমাজ সেই ভালোবাসাকে অনুমোদন দেয় না। প্রেমের এই নতুন অধ্যায়ে মহামায়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দৃঢ়তা আরও স্পষ্ট হয়। যখন প্রেমিক তাকে নিতে আসে, তখন সে সহজে আত্মসমর্পণ করে না; বরং পরিস্থিতির গভীরতা অনুধাবন করে সিদ্ধান্ত নেয়। মহামায়ার প্রতিবাদের আরেকটি দিক হলো তার আত্মমর্যাদাবোধ। সে জানে, তার অস্তিত্বের মূল্য শুধু সামাজিক পরিচয়ে সীমাবদ্ধ নয়। গল্পে বলা হয়েছে,

> "সে কেবল বিধবা নয়, সে একজন মানুষ, যে নিজের ইচ্ছামতো বাঁচতে চায়।"[১৯]

এই বাক্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে মহামায়া একজন নারীর প্রতীক, যে নিজের জীবনকে স্বাধীনভাবে গড়ে তুলতে চায় এবং যে কেবল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি ছায়া হয়ে থাকতে রাজি নয়।

গল্পের শেষ দৃশ্য মহামায়ার প্রতিবাদের এক অমোঘ প্রতীক। সে যখন নদীর স্রোতে নিজেকে সমর্পণ করে, তখন তা নিছক আত্মসমর্পণ নয়; বরং সমাজের রূঢ়তার বিরুদ্ধে তার চূড়ান্ত প্রতিবাদ। এই দৃশ্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, কখনও কখনও নীরব আত্মত্যাগও এক প্রকারের প্রতিবাদ হতে পারে। তার এই ত্যাগ কেবল ব্যক্তি মহামায়ার নয়, বরং পুরো নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহ। মহামায়ার এই প্রতিবাদ শুধুমাত্র নারী সমাজের পক্ষে নয়, এটি সামগ্রিকভাবে এক অনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথ সমাজের নিষ্ঠুরতার কথা ব্যক্ত করেছেন মহামায়ার জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে।

> "সমাজ তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না, সমাজ তাহাকে মন্দ বলিবে, কিন্তু মহামায়া তাহার আত্মার গরিমা বুঝিতে পারিয়াছে।"[২০]

এই কথাগুলো মহামায়ার প্রতিবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ, যেখানে সে সমাজের মানদণ্ডকে তুচ্ছ করে নিজের আত্মপরিচয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ 'মহামায়া' গল্পে শুধুমাত্র এক নারীর ব্যক্তিগত দুঃখগাঁথা বলেননি, বরং এটি এক বৃহত্তর সামাজিক সমস্যার দিকেও ইঙ্গিত করে। মহামায়ার চরিত্রের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে সমাজ যদি নারীর প্রতি অবিচার করে, তবে নারী নিজেই নিজের অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। তার প্রতিবাদ একদিকে যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সার্বজনীন।

সুতরাং, 'মহামায়া' গল্পে প্রতিবাদ এক বহুমাত্রিক রূপে প্রকাশ পেয়েছে— নারীর আত্মমর্যাদা, ভালোবাসার স্বাধীনতা এবং সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে এক অন্তর্নিহিত বিদ্রোহ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই গল্প শুধু মহামায়ার একক সংগ্রামের কাহিনি নয়, এটি সামগ্রিকভাবে নারীর সামাজিক অবস্থান ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠার এক অনন্য দলিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীদের আত্মসম্মান তথা মূল্যবোধ নিয়ে ছিলেন ওয়াকিবহাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে প্রতিবাদী নারীদের উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি নারীদের কেবল করুণার পাত্র হিসেবে দেখাননি, বরং তাদের ভাবনা, আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সাহিত্যে গুরুত্ব দিয়েছেন। সমালোচকের ভাষায়-

> "স্ত্রী জাতিরও যদি সেই স্বপরিচয় না থাকত তাহলে কেবলমাত্র পুরুষতান্ত্রিকতার অত্যাচার সহনে করুণার পাত্র হিসেবে তাদের কোনো অস্তিত্ব এতদিন টিকে থাকত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে, উপন্যাসে বিশেষকরে ছোটগল্পে নারীর এই স্বকীয়তাকে, সৃষ্টিতে প্রতিরোধে বিরোধে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠাকে বারে বারে তুলে ধরেছেন।"[২১]

তাঁর ছোটগল্পের নারীরা সমাজের বেঁধে দেওয়া সীমানার বাইরে গিয়ে নিজেদের অস্তিত্বের সন্ধান করে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে এবং কখনো প্রকাশ্য, কখনো নীরব প্রতিরোধের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়। এই প্রতিবাদ কখনো ব্যক্তিগত, কখনো সামাজিক, আবার কখনো নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে আসে। রবীন্দ্রনাথের নারী চরিত্রদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ্রোহী, কেউ ধৈর্যশীল, কেউ যুক্তিবাদী, আবার কেউ বেদনাহত কিন্তু সচেতন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল নিজের স্বাধীন সত্তাকে উপলব্ধি করে এবং সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করে সংসার ত্যাগ করে। 'দেনাপাওনা' গল্পের নিরুপমা শ্বশুরবাড়ির অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেও সমাজের কঠিন বাস্তবতার কারণে তার প্রতিবাদ আত্মহননের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। 'ল্যাবরেটরি' গল্পের নন্দিনী পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান দৃঢ় করে তোলে, যেখানে সে নিজেকে শুধু একজন পুরুষের স্ত্রী বা সঙ্গিনী হিসেবে সীমাবদ্ধ রাখতে চায় না, বরং তার নিজস্ব যোগ্যতা দ্বারা নিজের জীবনকে গড়ে তোলে। এই গল্পগুলোর নারী চরিত্রদের প্রতিবাদ কেবল সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে নয়, এটি আত্মপ্রতিষ্ঠারও লড়াই। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন, নারীর প্রতিবাদ মানেই সর্বদা বিদ্রোহ নয়, বরং এটি হতে পারে আত্মসচেতনতার প্রকাশ, যা ধাপে ধাপে সমাজ পরিবর্তনের পথে নিয়ে যেতে পারে। তাঁর সাহিত্যে নারীর প্রতিবাদ কখনো প্রেমের মোড়কে, কখনো বুদ্ধির পরীক্ষায়, কখনো বা চরম আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থান ও চিন্তাভাবনার বদল ঘটলেও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের এই প্রতিবাদী নারীরা আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁদের সংগ্রাম, আত্মসম্মানবোধ এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দৃঢ়ভাবে নিজের অবস্থান ধরে রাখার প্রচেষ্টা আজকের সমাজেও অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। তাঁর সাহিত্যে নারীর প্রতিবাদ শুধু ব্যক্তিগত মুক্তির সন্ধান নয়, এটি বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনেরও ইঙ্গিত বহন করে। তাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের এই নারীরা শুধু সাহিত্যের চরিত্র নয়, বরং তারা সময়ের চেয়েও অগ্রসর এক চেতনার প্রতিনিধি, যারা আজও আমাদের ভাবতে শেখায়, প্রশ্ন তুলতে উদ্বুদ্ধ করে এবং নিজের অবস্থান খুঁজে নিতে অনুপ্রাণিত করে।

তথ্যসূত্র:

১. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৩।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১১।
৩. তদেব, পৃ. ১২।
৪. পাল, অরূপ ও দাস, নিত্যানন্দ। বাংলা ছোটগল্পে বৈচিত্রের সন্ধান পাঠকের দৃষ্টিতে। পত্রলেখা, এপ্রিল ২০২২, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ২৭।
৫. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৪৫।
৬. মজুমদার, সমরেশ। রবীন্দ্রনাথের গল্প বিশ্লেষণী পাঠ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৯০।
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১৩৫।
৮. তদেব, পৃ. ৪৮২।
৯. তদেব, পৃ. ৪৮৩।
১০. তদেব, পৃ. ৪৮৪।
১১. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ১৪২।

১২. ঘোষ, তপোব্রত। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ। দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৩৯৭, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ৪৭।
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ৫০০।
১৪. তদেব, পৃ. ৫০১।
১৫. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৬৩।
১৬. তদেব পৃ. ৬৪।
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১১০।
১৮. তদেব, পৃ. ১১১।
১৯. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৮২।
২০. তদেব, পৃ. ৮৪।
২১. মিত্র, জয়া। নারীর মর্যাদার জন্য তাঁর আজীবন লেখার লড়াই। দেশ, ১৫মে ১৯৯৯, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৬৪।

আকর গ্রন্থ:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গল্পগুচ্ছ। দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০২, কলকাতা ৭০০০০৬।

সহায়কগ্রন্থ:

১. ঘোষ, তপোব্রত। রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ। দে'জ পাবলিশিং, বৈশাখ ১৩৯৭, কলকাতা ৭০০০৭৩।
২. দত্ত, ড. সঞ্চারী (মিত্র)। রবীন্দ্র-গল্পে আধুনিক নারী, সোনার তরী। নভেম্বর ২০০৬, কলকাতা-৯।
৩. পাল, অরূপ ও দাস, নিত্যানন্দ। বাংলা ছোটগল্পে বৈচিত্রের সন্ধান পাঠকের দৃষ্টিতে। পত্রলেখা, এপ্রিল ২০২২, কলকাতা ৭০০০০৯।
৪. ভট্টাচার্য, সুতপা। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যে নারী এবং মুশায়ের। জুলাই ২০১১, কলকাতা ৭০০০৭৩।
৫. মজুমদার, সমরেশ। রবীন্দ্রনাথের গল্প বিশ্লেষণী পাঠ। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, অগ্রহায়ণ ১৪০৫, কলকাতা ৭০০০০৯।
৬. মিত্র, জয়া। নারীর মর্যাদার জন্য তাঁর আজীবন লেখার লড়াই। দেশ, ১৫মে ১৯৯৯, কলকাতা ৭০০০০৯।
৭. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। কালের পুত্তলিকা। দে'জ পাবলিশিং, আগস্ট ১৯৮২, কলকাতা ৭০০০৭৩।
৮. সিংহ, মীনাক্ষী। গল্পগুচ্ছ জীবনের মেঘ ও রৌদ্র। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২২শে শ্রাবণ ১৪১১, কলকাতা ৭০০০০৯।